

শিক্ষার হালচাল ও বিপন্ন মূল্যবোধ

সমাজ ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান

অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের সন্তানের সুশিক্ষা, তাদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি করার জন্য তাই প্রয়োজন একটি আলোকিত ও কার্যকর জীবনধারায় ফিরে আসা। এ জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ তথা সদৃশের বিরতিহীন চর্চা; প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং কার্যকরভাবে এর চর্চার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তা না হলে অচিরেই নৈতিক কাঠামোহীন সমাজের চোরাগলিতে হারিয়ে যাবে জ্ঞাননির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম এবং ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন

হিসেবে শিক্ষকতা মেধাবীদের কাছে অনাকর্ষণীয় হওয়ায় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই অনৈতিক পন্থায় অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা এই মহান পেশায় প্রবেশ করছেন। এখন প্রশ্ন হলো, একজন অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ও নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তির কাছে শিক্ষার্থীরা কী পাবে? কী প্রত্যাশা করতে পারে? এই বাস্তবতা আমাদের সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা এই অনৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়, সে তার নিজের সন্তানসহ সবার সন্তানকে একটি অযোগ্য ও নৈতিকতাবিহীন ব্যক্তির কাছে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেন। আমাদের অনেকেই কোনো একটি রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সমর্থক। এতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। এটিই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সৌন্দর্য। সমস্যা তৈরি তখনই হয়, যখন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা, গৌণ হয়ে যায় এবং রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে। এটিই সমস্যার মূল কারণ। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ ধরনের নিয়োগ স্বয়ং নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিংবা নিয়োগদাতা কারও জন্যই কল্যাণকর নয়। কারণ তাদের কেউ নিশ্চয়ই চায় না যে, তাদের সন্তানকে বিশেষ কোনো ভাবাদর্শে বিশ্বাসী; কিন্তু অনৈতিক ও অযোগ্য এক ব্যক্তি পাঠদান করবেন। একজন যোগ্য ও নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের সন্তানকে পাঠদান করুক; তাই তারা প্রত্যাশা করে। আর তা কামনা করাটাই স্বাভাবিক। অথচ নিজ সন্তানসহ অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর এ ধরনের বিতর্কিত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা অবলীলায় সম্পৃক্ত হচ্ছি; যার কুফল তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর না

হলেও পরিণামে এর কুফল আমাদের ভোগ করতেই হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার কিছু কুফল আমরা ইতিমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছি। অর্থাৎ ভুক্তভোগী আমরা ও আমাদের সন্তানরা এ থেকে বেরিয়ে না এলে সঠিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞাননির্ভর ও নৈতিকভাবে আলোকিত একটি সমাজ তৈরির লক্ষ্য অর্জনে আমরা চরমভাবে ব্যর্থ হবো। অনেকে বলেন, উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন প্রাধান্য পাবে, টেকসই সমাজ ও পরিবেশ এবং নৈতিকভাবে আলোকিত জীবন মুখ্য বিবেচনার বিষয় নয়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উন্নয়নের নামে দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা এবং মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় যেমন, পাহাড়ধস, বনাঞ্চল ধ্বংস করা কিংবা উপকূলীয় এলাকায় দূষণ উন্নয়নকে টেকসই করে না বরং সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তথাকথিত প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত উন্নয়ন যে টেকসই নয়, এমন শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হলো শিক্ষা ও সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সামাজিক উন্নয়ন যে ক'টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তার অন্যতম দুটি হলো, সুশিক্ষা ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা। প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই দুটি লক্ষ্য অর্জন করা যাবে? এর সহজ কোনো উত্তর নেই কিংবা বলা যেতে পারে, এ লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্ত কোনো কর্মতালিকা তৈরি করা সহজ কাজ নয়। এ কথা বলা যায়, অন্যান্য জরুরি

পদক্ষেপের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর যথাযথ চর্চার কোনো বিকল্প এ ক্ষেত্রে নেই। দার্শনিক আরিস্টোটল এই মূল্যবোধকে সদৃশ নামে চিহ্নিত করেছেন। সদৃশ হলো সমাজে যে গুণগুলোকে সকলে মিলে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং চর্চা করেন। যেমন সততা, মহানুভবতা, বীরত্ব ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, এগুলোর চর্চা কি আমাদের সমাজে ব্যাপক পরিসরে হয়? বিশেষ করে বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজ জীবনে এর চর্চা কি কার্জিত পরিমাণে হয়? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মূল্যবোধ তথা সদৃশের চর্চা শুধু হাটসই পায়নি বরং প্রায় বিপন্ন হতে চলেছে। যেমন একসময় এই সমাজের মানুষই সাধারণত জীবিকা তথা পোশাক হিসেবে চাকরি, ব্যবসা-বাগিচা, মজুরি ইত্যাদি রীতি ও নীতিসিদ্ধ কর্মপন্থাকেই উপার্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করতেন; মিথ্যা বলা, চুরি করা কিংবা অন্যকে ঠকানো এসব কর্মে লিপ্ত হতেন নেহাত বিপদে পড়ে। যেমন অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতা সন্তানের জন্য জীবন রক্ষার্থে অন্ন জোগাড় করার জন্য মিথ্যা বলা, চুরি করা, লোক ঠকানোর মতো গর্হিত কর্মে লিপ্ত হতেন। আমরা লক্ষ্য করছি, অনেকেই চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি রীতিনীতিসিদ্ধ কর্মই নয় বরং মিথ্যা বলা, চুরি করা কিংবা লোক ঠকানোকেও উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। একে কী বলা যায়? মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাকি মূল্যবোধ আমূল পাল্টে যাওয়া। ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে এতদিন যা বলা হতো তা শুধু তালনিতেই গিয়ে পৌছায়নি বরং মানুষের নীতি-নৈতিকতা সংক্রান্ত ভাবনার জগতে এসেছে এক আমূল পরিবর্তন। দ্রুতগতিতে মূল্যবোধ পাল্টে যাওয়া একটি সমাজে আমাদের বসবাস। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে মূল্যবোধের চর্চায় আমরা কতটা পাল্টে গেছি। এখানে আর কেউ যেন কারও কাছে নিরাপদ নয়। যেমন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক নিরাপদ নয়, শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী নিরাপদ নয়, শিক্ষার্থীর কাছে ছাত্র রাজনীতি নিরাপদ নয়। এমনকি পিতা-মাতার কাছে সন্তান নিরাপদ নয়। আমাদের সন্তানের সুশিক্ষা, তাদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ তৈরি করার জন্য তাই প্রয়োজন একটি আলোকিত ও কার্যকর জীবনধারায় ফিরে আসা। এ জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ তথা সদৃশের বিরতিহীন চর্চা; প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং কার্যকরভাবে এর চর্চার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তা না হলে অচিরেই নৈতিক কাঠামোহীন সমাজের চোরাগলিতে হারিয়ে যাবে জ্ঞাননির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম এবং ন্যায্যভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়ছে পাসের হারও। এ-পাসের ছড়াছড়ি। এই বাস্তবতায় আমাদের আত্মতৃপ্তিতে থাকা উচিত। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে, আসলে আমাদের মনে স্বস্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ফল প্রমাণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের পড়ালেখা প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের তুলনায় নম্বর অর্জনেই অধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ আছে। প্রশ্ন হলো, এই দায় কার? এ জন্য কি শুধু শিক্ষার্থীরাই দায়ী? বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া (বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে) কিছুসংখ্যক ছাত্র যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জনের সাধনায় ব্রত থাকলেও অধিকাংশই যেন লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ও কালক্ষেপণের জালে আটকা পড়ে। ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্যবাহী ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে সংকীর্ণ স্বার্থের তথাকথিত নামমাত্র ছাত্র রাজনীতির কবলে পড়ে অছাত্রসুলভ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে নিজের এবং দেশের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। প্রশ্ন হলো, এই দায় কার? মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের এই বেহাল অবস্থার জন্য দায় বহন করতে হবে সেসব মানুষের, যারা বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় অভিভাবকের ভূমিকায় রয়েছেন। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে এই ব্যবস্থার বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থা ও শিক্ষকমণ্ডলী সবার ওপরই দায় বর্তায়। জ্ঞানচর্চা উপযোগী কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরির ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের কাছে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিতর্ককেন্দ্রিক স্থান দখল করে নেয়। ফলে বিসর্জনে যায় জ্ঞানবান্ধব পাঠ্যসূচি। তাই প্রয়োজন একটি নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থা, যা হবে জ্ঞানভিত্তিক। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্মরত অধিকাংশ অদক্ষ কর্মকর্তার দায়িত্বহীনতার জন্য পাঠ্যপুস্তকে নানা ধরনের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রয়োজন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের দায়িত্বশীল করে তোলা। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বিদ্যমান শিক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম একটি দুর্বল দিক। এর দুটি কারণ রয়েছে— ১. ক্রমান্বয়ে 'শিক্ষকতা' পেশা হিসেবে মেধাবীদের কাছে অনাকর্ষণীয় হয়ে ওঠা ও ২. নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব (যেমন, অর্থের বিনিময়ে অনৈতিক পন্থায় অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া)। প্রথম সমস্যাটির কারণ হলো শিক্ষকদের (বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে) অর্থোক্তিক বেতন কাঠামো (অর্থাৎ বেতন স্কেলের তালিকায় নিচের দিকে অবস্থান)। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এই চিত্রটি ভিন্ন। দ্বিতীয় কারণটি আরও উদ্বেগজনক। পেশা